কালের কণ্ঠ

আপডেট : ২১ মার্চ, ২০১৮ ২৩:১৭

পরীক্ষা পদ্ধতির সংস্কার সময়ের দাবি

মাছুম বিল্লাহ

বহু বছর ধরে আমাদের পরীক্ষা পদ্ধতিতে শর্ট কোয়েশ্চেন ও ব্রড কোয়েশ্চেন চালু ছিল, যেখানে একজন শিক্ষক তাঁর ইচ্ছামতো নম্বর দিতেন। কোনো ধরনের স্ট্যান্ডার্ড মার্কিং সিস্টেম ছিল না। ব্রর্ড টাইপ কোয়েশ্চেন থাকত একেকটি ১২ নম্বরের, শর্ট টাইপ ৬ নম্বরের। একজন শিক্ষার্থী মোটামুটি ভালো লিখলে ৫-৬ নম্বর পেত, খুব ভালো লিখলে ৭ পেত অর্থাৎ ৫৮.৩৩ শতাংশ নম্বর। ৬০ শতাংশ নম্বর পেলে প্রথম বিভাগ পেত একজন শিক্ষার্থী, সে জন্য তাকে ৭.৫ কিংবা ৮ নম্বর পেতে হতো। ১২-এর মধ্যে ৮ পাওয়া মানে ৬৬.৬৬ শতাংশ নম্বর পাওয়া। একমাত্র এক্সসেপশনাল না লিখলে ৮ পাওয়া যেত না। শর্ট টাইপ কোয়েশ্চেনে ছয়ের মধ্যে তিন পেলে মোটামুটি ৫০ শতাংশ নম্বর আর ৩.৫ পেলে ৫৮.৩৩ আর ৪ পেলে ৬৬.৬৬ শতাংশ নম্বর পেত অর্থাৎ ভালো শিক্ষার্থীরাই এই নম্বর পেত। সেখানে ভাষা ব্যবহার ও প্রাসঙ্গিকতা দেখা হতো। বাংলা, ইংরেজি, সমাজবিজ্ঞান, ভূগোল ইত্যাদি বিষয়ের ক্ষেত্রে এ রকমই ছিল। প্রথম বিভাগ যারা পেত তাদের ধরেই নেওয়া হতো মোটামুটি মেধাবী শিক্ষার্থী। শিক্ষার্থীরা গণিত ও বিজ্ঞানে কিংবা কমার্সের বিষয়গুলোতে নম্বর একটু এগিয়ে থাকত বলে প্রথম বিভাগ পেত। বাংলা, ইংরেজি, সমাজবিজ্ঞান, ইতিহাস, ভূগোল ইত্যাদি বিষয়ে ফার্স্ট ডিভিশন মার্ক পাওয়া ছিল বেশ কষ্টসাধ্য। এই পদ্ধতির সমস্যা ছিল একেক শিক্ষক একেক ধরনের নম্বর দিতেন, তবে মোটামুটি অভিজ্ঞ শিক্ষকরা হাতের আন্দাজে নম্বর দিতেন, তাতে একে অপরের নম্বরের মধ্যে খুব বেশি হেরফের হতো না। কিন্তু সমস্যা ছিল—নতুন, অনভিজ্ঞ, কেয়ারলেস কিছু শিক্ষককে নিয়ে। তাঁরা এই মূল্যায়ন পদ্ধতিতে অনেক সময় মূল্যায়নের ক্ষেত্রে সমস্যার সৃষ্টি করতেন। যেখানে দেওয়া দরকার ২ নম্বর, সেখানে তাঁরা ৪ কিংবা ৫ দিয়ে বসে থাকতেন, আবার কেউ কেউ যেখানে দেওয়া দরকার ৬ কিংবা ৭ সেখানে হয়তো ৩-৪ নম্বর দিতেন। নম্বর দেওয়া অনেক সময় তাঁদের মনমেজাজের ওপর নির্ভরশীল ছিল। এ ধরনের মূল্যায়ন পদ্ধতি ছিল সাবজেকটিভ অর্থাৎ ব্যক্তির মতো খুশি হওয়া অখুশি হওয়ার ওপরই নম্বর প্রদান নির্ভর করত। ফলে শিক্ষার্থীরা ভিকটিম হতো। অনেক দেশেই বহু নির্বাচনী পদ্ধতিতে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়, সেখানে পরীক্ষার উত্তরপত্র মূল্যায়ন করতে সুবিধা হয় এবং ব্যক্তির খেয়ালখুশির ওপর নম্বর দেওয়ার সুযোগ থাকে না। ফলে কোনো শিক্ষক ইচ্ছা করলেও বা তাঁর ইচ্ছামতো নম্বর দিতে পারেন না। একজন শিক্ষার্থী যত এমসিকিউ প্রশ্নের উত্তর সঠিক করবে, প্রতিটির বিপরীতেই সে নম্বর পাবে।

আমাদের পরীক্ষা পদ্ধতিতে কোনো প্রকার সমীক্ষা ছাড়াই অনেক দেশের উদাহরণ থেকে ৪০-৫০ নম্বরের বহু নির্বাচনী অভীক্ষা শুরু করা হলো নব্বইয়ের দশকে। শিক্ষার্থীদের অনায়াসে প্রথম বিভাগে পাস করা তো কোনো বিষয়ই নয়, সাধারণ মানের সব শিক্ষায়ই ৭৫ শতাংশ নম্বর পাওয়া শুরু করল, যারা পেত ৪৫০ কিংবা ৫০০ নম্বর অর্থাৎ ট্র্যাডিশনাল পরীক্ষা পদ্ধতিতে যারা দ্বিতীয় বিভাগ পেত, তারা সবাই পাওয়া শুরু করল স্টার মার্ক, যা ওই পদ্ধতিতে ছিল উচ্চতম মাত্রার ফল অর্থাৎ প্রথম বিভাগেরও পরের স্তর। আমাদের এমসিকিউ প্রশ্ন সে রকম বুদ্ধিমত্তার পরিচয় বহন করত না। এখন তার সঙ্গে যুক্ত হলো প্রশ্নপত্র ফাঁস হওয়া। অর্থাৎ মূল্যায়ন পদ্ধতিকে একেবারে ধ্বংসের কিনারে নিয়ে আসা হলো। তাই সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে বহু নির্বাচনী প্রশ্ন আর থাকবে না। এটি কয়েক বছর আগে থেকেই শুরু হয়েছে এবং ধীরে ধীরে এমসিকিউর নম্বর কমিয়ে ফেলা হচ্ছে। বর্তমানে পরীক্ষার প্রশ্নপত্রে ৭০ শতাংশ প্রশ্ন থাকে সৃজনশীল, ৩০ শতাংশ থাকে এমসিকিউ। অভিযোগে দেখা যায়, এমসিকিউ অংশের প্রশ্নই বেশি ফাঁস হচ্ছে। এ জন্য এমসিকিউ তুলে দেওয়ার কথা উঠছে। প্রশ্নপত্র ফাঁস হচ্ছে, তাই বলে এমসিকিউ প্রশ্ন পুরোটাই যে তুলে দিতে হবে এটি যুক্তিসংগত কথা নয়।

২০১০ সালের পর থেকে শিক্ষাবিদ, সচেতন অভিভাবক, নাগরিক সমাজ বারবার শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে বলে আসছে, পরীক্ষা শিক্ষার অর্জিত ফল যাচাইয়ের কৌশল বটে; কিন্তু কিছুতেই পরীক্ষা শিক্ষণ-শিখনের বিকল্প নয়; পরীক্ষাকে অধিক গুরুত্ব দেওয়ার সুযোগ নেই। শিক্ষার্থীকে শুধুই পরীক্ষার্থী বানিয়ে, পরীক্ষার নামে শিক্ষাকে নির্বাসনে দিয়ে লাখ লাখ তরুণকে জিপিএ ফাইভে ভাসিয়ে অযোগ্য শিক্ষক নিয়োগ দিয়ে যে বিষবৃক্ষ দেশে রোপণ করা হয়েছে, সেই বিষবৃক্ষের ফলই এখন জাতি প্রত্যক্ষ করছে। পরীক্ষার ডামাডোলে শিক্ষা নিয়ে হরেক রকম ব্যবসার বিস্তার ঘটেছে। নোট-গাইডের চেয়ে মারাত্মক হচ্ছে প্রশ্ন ফাঁস। ২০১০ সাল থেকে সৃজনশীল প্রশ্নে পরীক্ষা গ্রহণ শুরু হয় কোনোরূপ পূর্বপ্রস্তুতি ছাড়াই। সাত-আট বছর পরও সৃজনশীল প্রশ্ন আয়ত্ত করতে পারছে না বেশির ভাগ শিক্ষক ও শিক্ষার্থী। ফলে প্রসার ঘটেছে নোট-গাইডের আর শিক্ষার্থীর নিজস্ব চিন্তার জায়গাটি হয়েছে আরো সংকুচিত, সেই সঙ্গে শিক্ষকদেরও।

এটি ঠিক যে এমসিকিউ প্রশ্নপত্রে শিক্ষার্থীরা পরীক্ষার হলে খুব দ্রুত একে অপরকে বলে দেয়, ফলে প্রকৃত মূল্যায়ন হয় না। কিন্তু এমসিকিউ তো একবারে ধারাবাহিক দিলে হবে না। দিতে হবে অত্যন্ত বুদ্ধিমত্তা ও চতুরতার সঙ্গে। যেমন–বড় প্রশ্নের মধ্যে হঠাৎ সেই প্রসঙ্গে কয়েকটি এমসিকিউ। তা আবার 'ক' সেটে এক রকম, 'খ' সেটে অন্য রকম। বিষয় ও উত্তর একই থাকবে। প্রথম থেকে ৩০টি এমসিকিউ থাকা ঠিক নয়, তাহলে তা সহজেই নকল করা যায়, ফাঁস করা যায়। প্রশ্নের মাঝে মাঝে থাকবে এমসিকিউ। এক. 'ক' সেটের এক নম্বরে যে প্রশ্নটি থাকবে, সেই একই প্রশ্ন 'খ' সেটের তিন নম্বরে থাকবে আরো উল্টিয়ে-পাল্টিয়ে। এভাবে থাকলে শিক্ষার্থীরা সহজে বলাবলি করতে পারবে না। এমসিকিউগুলো বড় প্রশ্নের মাঝামাঝি থাকবে বড় প্রশ্নের উত্তরের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। কিন্তু পুরোপুরি বাদ দেওয়া ঠিক হবে না।

পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁসের বিভিন্ন ঘটনায় জানতে পারি যে বিজি প্রেসে ২৫০-এর বেশি লোক জড়িত থাকেন প্রশ্ন ছাপাতে। বিজি প্রেসে যে প্রক্রিয়ায় এসএসসির প্রশ্ন ছাপা হয়েছে, তাতে যে কারো পক্ষে সেখান থেকে প্রশ্ন ফাঁস করা সম্ভব। এসএসসির প্রশ্ন ছাপা হওয়ার পর তার মূল প্লেট ধ্বংস করা হয়নি। মূল প্লেট রেখে দেওয়া হয়েছিল অরক্ষিত অবস্থায়। সেখান থেকে যে কারো পক্ষে প্রশ্নপত্র ফাঁস করা সম্ভব। প্রশ্নপত্র ছাপানোর পর হাতে হাতে প্যাকেজিং করেন বিজি প্রেসের কর্মচারীরা। কারো হাতের ছাপ ছাড়া অটোমেশন পদ্ধতিতে প্যাকেজিং করার ব্যবস্থা না থাকায় সেই প্রক্রিয়া থেকেও প্রশ্নপত্র ফাঁস হওয়ার আশঙ্কা থাকে। এ ছাড়া বিজি প্রেসে যে পদ্ধতি ব্যবহার করে সিটিটিভি বসিয়ে প্রশ্নপত্র ছাপানোর সঙ্গে জড়িতদের গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করা হয়, সেখানে রয়েছে শুভংকরের ফাঁকি। সিসিটিভিতে মুভিং সিস্টেম বসানো। এতে এক পাশ ঘুরে আসার সময় সিসিটিভির আওতার বাইরে থাকছে অন্য পাশ। বর্তমানে বিজি প্রেসে যেভাবে প্রশ্নপত্র ছাপা হয়, তাতে একটি প্রশ্নপত্রের পাণ্ডুলিপি গ্রহণ থেকে শুরু করে প্যাকেজিং হওয়া পর্যন্ত ২০০ থেকে ২৫০ জন সম্পৃক্ত থাকেন সংস্থাটির। প্রশ্নপত্র নিয়ে যাঁরা সার্বক্ষণিক কাজ করেন, তাঁরা সবাই তখন প্রশ্নপত্র দেখতে পারেন। এবারের এসএসসি পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ছাপা হতে লেগেছিল দুই মাসের বেশি। ছাপা হওয়ার পর প্রশ্নের প্রুফ দেখে ১৫ থেকে ২০ জনের একটি দল। এই বিষয়গুলো বিবেচনায় না নিয়ে হঠাৎ করে এমসিকিউ পুরোটাই বাদ দেওয়া মানে 'মাথা ব্যথার জন্য মাথা কেটে ফেলার মতো অবস্থা।' বিজি প্রেসে প্রশ্নপত্র না ছাপিয়ে বিকল্প কী চিন্তা করা যায় তা দেখা উচিত, আর বিজি প্রেসে যদি ছাপাতেই হয়, তাহলে উপরোক্ত সমস্যাগুলো মাথায় রেখে কাজ করতে হবে।

আমি যখন সরাসরি শিক্ষকতার সঙ্গে যুক্ত ছিলাম, তখন এক বোর্ডের টিচার অন্য বোর্ডের প্রশ্ন তৈরি করতেন। আমি কুমিল্লা ছেড়ে এসে যখন ঢাকায় ছিলাম (মির্জাপুর ক্যাডেট কলেজ, রাজউক কলেজ) তখন কুমিল্লা বোর্ডের প্রশ্ন তৈরি করতাম। নির্দেশ থাকত, প্রশ্ন সিলগালা করে পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের কাছে পাঠানোর পর রাফ বা অবশিষ্ট যা কিছুই থাকুক না কেন, সেগুলো পুড়িয়ে ফেলে মাটিচাপা দিয়ে রাখতে হবে। তখনকার শিক্ষকরা তা-ই করতেন। জানি না, এখন এক বোর্ডের শিক্ষক অন্য বোর্ডে গিয়ে প্রশ্ন করেন কি না এবং এত গোপনীয়তা রক্ষা করা হয় কি না।

লেখক : ব্র্যাক শিক্ষা কর্মসূচিতে কর্মরত সাবেক ক্যাডেট কলেজ ও রাজউক কলেজ শিক্ষক

masumbillah65@gmail.com

Print

সম্পাদক : ইমদাদুল হক মিলন,
নির্বাহী সম্পাদক : মোস্তফা কামাল,
ইস্ট ওয়েস্ট মিডিয়া গ্রুপ লিমিটেডের পক্ষে ময়নাল হোসেন চৌধুরী কর্তৃক প্লট-৩৭১/এ, ব্লক-ডি, বসুন্ধরা, বারিধারা থেকে প্রকাশিত এবং প্লট-সি/৫২, ব্লক-কে, বসুন্ধরা, খিলক্ষেত, বাড্ডা, ঢাকা-১২২৯ থেকে মুদ্রিত।
বার্তা ও সম্পাদকীয় বিভাগ : বসুন্ধরা আবাসিক এলাকা, প্লট-৩৭১/এ, ব্লক-ডি, বারিধারা, ঢাকা-১২২৯। পিএবিএক্স : ০২৮৪০২৩৭২-৭৫, ফ্যাক্স : ৮৪০২৩৬৮-৯, বিজ্ঞাপন ফোন : ৮১৫৮০১২, ৮৪০২০৪৮, বিজ্ঞাপন ফ্যাক্স : ৮১৫৮৮৬২, ৮৪০২০৪৭। E-mail : info@kalerkantho.com